রহস্যরেখা

Bidyut Mudi

📖 **গল্পের নাম:**
রহস্যরেখা

লেখক:
Bidyut Mudi

প্রকাশক:
BMS BookNest

Copyright © 2025
by BMS BookNest

All rights reserved. No part of this eBook may be reproduced, stored, or transmitted in any form—electronic, mechanical, digital, photocopying, recording, or otherwise—without the prior written permission of BMS BookNest.

Published in India
First eBook Edition: September 2025

স্বত্ব © ২০২৫
BMS BookNest

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। BMS BookNest-এর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই ই-বুকের কোনো অংশ পুনর্মুদ্রণ, সংরক্ষণ বা প্রচার করা যাবে না—ইলেকট্রনিক, মেকানিকাল, ডিজিটাল, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনো মাধ্যমে।

ভারতে প্রকাশ
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিঃ দ্রঃ
চরিত্র, ঘটনা, স্থান এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ কল্পনার উপর ভিত্তি করে লেখা।
যদি কোনো চরিত্র বাস্তব জীবনের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মিলে যায়, তা কেবল কাকতালীয়।
গল্পে দেখানো শহর, রাস্তা, বাড়ি, সময়কাল—সবই লেখকের কল্পনা।
হত্যাকাণ্ড, রহস্য, তন্ত্র-মন্ত্র, এবং চরিত্রদের আবেগ-প্রতিক্রিয়া সবই সাহিত্যিক কল্পনা।
লেখক কোনো বাস্তব ব্যক্তি বা ঘটনার অপমান করার উদ্দেশ্যে লিখেননি।

এই বই শুধুমাত্র পাঠকের বিনোদন এবং গল্পের আনন্দের জন্য লেখা হয়েছে।

Disclaimer

All characters, events, locations, and situations in this story are entirely **fictional**.
If any character happens to resemble a real-life person, it is purely **coincidental**.
All cities, streets, houses, and timelines depicted in the story are **imagined by the author**.
Murders, mysteries, tantra-magic, and the emotions and reactions of the characters are all **literary fiction**.
The author does not intend to insult or harm any real person or event.

This book is written solely for the reader's entertainment and enjoyment of the story.

রহস্যরেখা

আনাড়া শহরটা আসলে খুব ছোট নয়, আবার খুব বড়ও নয়। আনাড়া শহরটা মালভূমির বুকেই দাঁড়িয়ে। লাল মাটির রাস্তা, শাল-শিমুল-পলাশের বন, গ্রীষ্মে জ্বলে ওঠা মাটি আর বর্ষায় ভেসে যাওয়া কাদার স্রোত—সব মিলিয়ে এক সাধারণ, শান্ত শহর।
এখানে বড় কোনো অপরাধের খবর আগে কখনো শোনা যায়নি। মানুষজন চাষাবাদ করে, ব্যবসা করে, উৎসবে মেতে ওঠে। **খুন?** সন্ত্রাস? এসব যেন কেবল বাইরের দুনিয়ার গল্প।

সজল চৌধুরী এই শহরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী।
সম্পদশালী, ব্যবসায়ী, জমিদারি ভাবমূর্তি আছে। শহরের বেশ কিছু জমি, কল-কারখানা, এমনকি বাজারের দোকানগুলোতেও তার প্রভাব।

লোকটা আসলে খারাপ ছিল না।
অনেক সময় গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ দিত, কারো ঘরে বিয়ের টাকায় সমস্যা হলে সজলই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। মানুষ জানত, তার কাছে গেলে খালি হাতে ফিরতে হবে না।

এক গ্রীষ্মের রাত। ফাল্গুন মাসের শেষ দিক। চারদিকে হালকা গরম হাওয়া বইছে। সজল চৌধুরীর বাড়ি শহরের একদম উত্তর কোণে, উঁচু পাঁচিল দেওয়া প্রাসাদের মতো বাড়ি। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল। আশেপাশের লোকজন দৌড়ে এলো, কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কয়েক মিনিটের ভেতরেই খবর ছড়িয়ে পড়ল—সজল চৌধুরী খুন হয়েছেন।

শহরের বুক কেঁপে উঠল। এতদিনে প্রথমবার আনারার মাটিতে রক্ত পড়ল। যে মানুষ একদিকে সাহায্য করত, আবার অন্যদিকে শত্রুও তৈরি করেছিল—তারই মৃত্যু রহস্যে মোড়া।

পরদিন সকালে আনারা য় পৌঁছালেন গোয়েন্দা অনিক পাল। খাটো, শান্ত স্বভাবের মানুষ। তার চোখে সবসময় এক ধরনের ধূসর সতর্কতা।
স্থানীয় থানার অফিসাররা বলল, "স্যার, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু জানালা অর্ধেক খোলা। খুনটা ভেতরে হয়েই গেছে।"

অনিক চারপাশ ঘুরে দেখলেন। মেঝেতে রক্ত, টেবিল উলটে গেছে, আর সজল চৌধুরীর হাত থেকে একটা ভাঙা কাগজ পাওয়া গেছে—মনে হলো কাউকে কিছু লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি।

কাগজে লেখা মাত্র তিনটি অক্ষর—**"অ..নি.."**

ঘরে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেল।

"এটা কি কারো নামের ইঙ্গিত?"—একজন পুলিশ ফিসফিস করে বলল।
আনিক কাগজটা নিজের ফাইলে রেখে দিলেন। মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, শুধু ঠান্ডা চোখে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখছেন।

শহরের মানুষজন আতঙ্কে ভুগতে শুরু করল। আনারায় এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। বাজারে যাওয়া লোকেরা ফিসফিস করে কথা বলত—
"সজলবাবু ভালো মানুষ ছিলেন, অনেককে সাহায্য করেছেন।"
অন্য কেউ বলত—"না না, তিনি কারও জমি দখল করেছিলেন, অনেক শত্রু তৈরি হয়েছিল।"
কেউ কেউ তো একেবারে বাড়ি থেকে বেরোত না, ভাবত—যদি খুনি আবার আঘাত করে!

অনিক চারদিকে খোঁজখবর নিলেন। প্রথমেই সজলের নিকটজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল।

সজলের স্ত্রী মধুমিতা

মধুমিতা ভাঙা গলায় বললেন,
"ও খুব ভালো মানুষ ছিল গো স্যার। গ্রামের গরিব মানুষদের জন্য কত কিছু করত! কিন্তু ব্যবসার দুনিয়ায় অনেক শত্রু বানিয়েছিল। আমি জানি না কে ওকে শেষ করে দিল।"

অনিক শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,
"সেদিন রাতে কি কোনো শব্দ শুনেছিলেন?"

"না স্যার, আমি আলাদা ঘরে ছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনে দৌড়ে আসি। তখন সব শেষ হয়ে গেছে।"

বিশ্বস্ত কর্মচারী হরিদাস

হরিদাস বলল,
"সাহেব কঠিন লোক ছিলেন, কিন্তু সাহায্য করতে জানতেন। তবে কিছুদিন ধরে দেখছিলাম, উনি ভীষণ অস্থির ছিলেন। বারবার বলতেন—'আমাকে কেউ শেষ করে দেবে।' কারও নাম নেননি।"

রাতের বেলা একা বসে অনিক পাল নোট লিখছিলেন। সামনে রাখা সেই ভাঙা কাগজে লেখা অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন—
"অ..নি..
এটা কি কাকতালীয়? না কি আসলেই আমার নাম লেখা ছিল? আনিক?"

একটা ঠান্ডা শিহরণ তার শরীর বেয়ে নেমে গেল।

শহরের ভেতরে ধীরে ধীরে ভয় জমতে লাগল। প্রতিদিন নতুন নতুন গুজব ছড়াতে থাকল। কে খুনি? বাইরে থেকে আসা কেউ? নাকি আনারার ভেতরেই কেউ এত বড় ষড়যন্ত্র করেছে?

গোয়েন্দা অনিক পাল চুপচাপ বসে আছেন, মুখে কোনো ভাব প্রকাশ নেই। কিন্তু তার মনের গভীরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা—

যদি সেই কাগজটা সত্যিই তার নামের দিকে ইঙ্গিত করে? যদি সজল চৌধুরী মৃত্যুর মুহূর্তে খুনির নাম ফাঁস করে দিয়ে যান?

আর যদি তাই হয়, তাহলে খুনির ছদ্মবেশে সবচেয়ে বড় রহস্যটা লুকিয়ে আছে...

সজল চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকে আনারার বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠল। সকালবেলা হাটে যে হাসাহাসি, দরদাম, খেজুর গুড়ের গন্ধ—সবই যেন এক ছায়ার নিচে চাপা পড়েছে। রাস্তাঘাটে লোকজন ফিসফিস করে কথা বলে, সবাই একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখে।

অনিক পাল প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে পড়তেন। কখনো পুরনো বন্ধুদের খুঁজে বের করেন, কখনো ব্যবসার হিসাব ঘাঁটেন, কখনো সজলের জমি-জমার বিরোধীদের খোঁজ করেন। একে একে ছবিটা পরিষ্কার হচ্ছিল—সজল অনেককে সাহায্য করেছে, কিন্তু অনেককেই চূর্ণ করেছে।

বাজারে লোকে বলত, "বিনয়বাবু একসময় অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু সজল চৌধুরীর কারণে সব হারিয়েছেন।"

অনিক ডেকে পাঠালেন বিনয়কে।
বিনয় আসতেই চোখ লাল, মুখ শুকনো।
– "আপনার সঙ্গে সজলের সম্পর্ক কেমন ছিল?" অনিক জিজ্ঞেস করলেন।
– "সম্পর্ক? সে কি কোনো সম্পর্ক রেখেছিল? আমার জমি দখল করল, ব্যবসা লাটে তুলল। আমি কিছু বলতে পারিনি, কারণ তার ক্ষমতা সবদিকে ছড়ানো।"
– "তাহলে আপনি কি প্রতিশোধ নিতে চাইতেন?"
– বিনয় ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ, চাইতাম... কিন্তু সাহস হয়নি। আমি জানতাম ওকে হাত দেওয়া মানে নিজের কবর খোঁড়া।"

অনিক চুপ করে রইলেন। মনের ভেতরে এক রেখা আঁকলেন—বিনয়কে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।

এক সন্ধ্যায় অনিক সজলের ঘরে খুঁজতে গিয়ে একটি পুরনো ডায়েরি পেলেন।
পাতাগুলোতে নানা হিসাব, জমি-ব্যবসার নোট লেখা। কিন্তু শেষের পাতায় হঠাৎ থেমে গেছে। সেখানে লেখা আছে—

"আমার চারপাশে ষড়যন্ত্র ঘুরছে। আমি জানি, আমায় শেষ করতে চাইছে। কিন্তু যাকে আমি বিশ্বাস করি, সেই-ই সবচেয়ে বড় ছুরি লুকিয়ে রেখেছে।"

এই লাইন পড়ে অনিকের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।
"যাকে আমি বিশ্বাস করি..."
মানে কি খুনি খুব কাছের কেউ?

সজলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ব্যবসায়িক অংশীদার **সুমিত দে** আনিকের সামনে উপস্থিত হল।

– "সজলদা কি কারও সঙ্গে শত্রুতা করছিল?" আনিক জিজ্ঞেস করলেন।
– সুমিত ভাঁজ করা কাগজে তাকিয়ে বলল, "একজন রাজনৈতিক নেতা তাকে হুমকি দিয়েছিল। বলেছিলেন—'সুযোগ পেলেই শেষ করব।'"
– "নাম কি জানেন?"
– "না। কিন্তু সে ব্যক্তি শহরের প্রভাবশালী। খুব সাবধান।"

রাত গভীর,অনিক পাল তার টর্চ হাতে নিয়ে **সজল চৌধুরীর** গুদামের দিকে এগোলেন। গুদামের ঢুকতেই মাটিতে পড়ে আছে **রক্তমাখা ছুরি**, পাশে ছেঁড়া কাগজপত্র, এবং একটি লাল রুমাল—প্রথম চিহ্ন যা খুনির পরিকল্পনা প্রকাশ করছে।

গুদামের ভিতরে ঢুকেই অনিক লক্ষ্য করলেন—মেঝেতে দুটি পায়ের ছাপ, একটি বড়, শক্তপোক্ত পায়ের, আর অন্যটি ছোট। মনে হলো, বড় পায়ের ছাপ খুনির, আর ছোটটি হয়তো সহায়ক বা অংশীদার।

তিনি লাল রুমালের দিকে নজর দিলেন। প্রথমে মনে হলো তুচ্ছ, কিন্তু অনিক জানতেন, প্রতিটি সূত্র গুরুত্বপূর্ণ। টর্চের আলো ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি কাগজের টুকরো নিলেন—"অ..নি.." লেখা। হৃদয় চেপে গেল।
"খুনি কি আমাকে সরাসরি টার্গেট করছে?"

সকালবেলায় গোটা শহর হইচই করে উঠল। গুদাম থেকে পাওয়া ছুরি আর লাল রুমালের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকে বলাবলি করছে—
"খুনির চিহ্ন নাকি পাওয়া গেছে।"
"তবে কি ধরা পড়বে?"
"কে জানে, আনারা শহরেরই কেউ নাকি বাইরের লোক…"

অনিক পাল নিঃশব্দে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের মুখের অভিব্যক্তি দেখছিলেন। শহরের মানুষজন আতঙ্কে, কিন্তু কৌতূহলও চেপে রাখা যাচ্ছে না।

সজলবাবুর স্ত্রী মধুমিতা আবার থানায় এসে কান্নাকাটি করতে লাগলেন—
"স্যার, আমার ঘরে কে যেন ঢুকে আলমারি তছনছ করেছে! ওর (সজলের) কিছু কাগজপত্র হয়তো খুঁজছিল। আমি বুঝতে পারছি না কারা এটা করছে।"

অনিক শান্তভাবে ঘরটি পরীক্ষা করলেন। আলমারির নিচে এক টুকরো হলুদ কাগজ পাওয়া গেল। তাতে সজলবাবুর হাতের লেখা—
"গুদামে যে খোকাকে আমি বড় করেছি, সেই-ই আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।"

"খোকা?"—অনিক নিজেকে প্রশ্ন করলেন।
কে এই খোকা?

মধুমিতা ভাঙা গলায় বললেন—"সজলদা ছোটবেলা থেকে হরিদাসকে নিজের ছেলের মতো দেখত। ওর নামও অনেক সময় 'খোকা' বলে ডাকত।"

অনিক হরিদাসকে ডেকে পাঠালেন। হরিদাস কাঁপতে কাঁপতে এল।
– "তুমি কি সেদিন রাতে গুদামে গিয়েছিলে?"
– "না স্যার… আমি তো সবসময় বাইরে থাকি। সাহেব আমাকে বিশ্বাস করত।"
– "তাহলে ছুরিতে তোমার আঙুলের ছাপ কেন পাওয়া গেল?"

হরিদাস একেবারে ঘামতে শুরু করল।
– "আমি… আমি জানি না স্যার। হয়তো কাজ করতে গিয়ে…"

অনিক থেমে গেলেন। তার চোখ সরু হয়ে এলো। তিনি জানেন, আতঙ্কিত মানুষ মিথ্যে বললেও চোখ ফাঁস করে দেয়।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে আওয়াজ এলো। লোকজন চিৎকার করছে—
"খুনি ধরা পড়েছে! খুনি ধরা পড়েছে!"

অনিক দ্রুত বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনকে টেনে আনা হচ্ছে। তার নাম বিনয়—যে একসময় ব্যবসায়ী ছিল, পরে সজলের হাতে সর্বনাশ হয়েছিল।

বিনয়ের গলা রুদ্ধ হয়ে গেছে।
– "হ্যাঁ, আমি চেয়েছিলাম ও মরে যাক। কিন্তু আমি খুন করিনি! আমি শুধু ওর গুদামের সামনে গিয়েছিলাম। সত্যি বলছি, আমি করিনি!"

অনিক স্থির চোখে তাকালেন। মানুষের চিৎকার থামিয়ে দিলেন।
– "শান্ত হন। খুনি এত সহজে ধরা পড়ে না।"

তিনি জানতেন, বিনয় হয়তো সত্যিই শত্রুতা পুষে রেখেছিল। কিন্তু প্রকৃত খুনি এখনও ধরা দেয়নি।

সেদিন রাতে আবার গোপন সূত্র এলো—
শহরের উপকণ্ঠে পরিত্যক্ত একটি কারখানায় কিছু অচেনা লোক জড়ো হয়েছে।

অনিক টর্চ আর রিভলভার নিয়ে সেখানে পৌঁছালেন।
দূর থেকে শুনতে পেলেন ফিসফিস—
"সব কাগজ কি নিয়ে এসেছিস?"
"হ্যাঁ, তবে সাবধান। গোয়েন্দা ঘুরছে।"

অনিক হঠাৎ টর্চ জ্বালিয়ে দিলেন।
চারজন লোক দৌড়ে পালাল। একজনের হাত থেকে পড়ে গেল একটি পুরনো ফাইল।

ফাইলে লেখা—
"অনিক পাল—পরের শিকার।"

অনিক পালের হাত কাঁপেনি, কিন্তু বুকের ভেতরটা ধকধক করতে লাগল। ফাইল খুলে তিনি দেখলেন—ভেতরে সজল চৌধুরীর জমি কেনাবেচার কাগজ, কয়েকটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর একটা অদ্ভুত চিঠি।

চিঠিতে লেখা—
"যে বিশ্বাস করবে, সে-ই মরবে।"

অনিক ঠান্ডা শ্বাস ফেললেন। এর মানে খুনি শুধু সজলকেই শেষ করেনি, বরং আরও কাউকে টার্গেট করেছে। আর তার নিজের নাম ফাইলে থাকাটা নিছক কাকতালীয় নয়।

কারখানার ভাঙা দেওয়ালে হঠাৎ টুক করে শব্দ হল। অনিক বন্দুক উঁচিয়ে ধরলেন।
– "কে?"

আলো ফেলে দেখা গেল, এক কিশোর ভয়ে কাঁপছে।
– "স্যার… আমি কিছু করিনি। আমি শুধু দেখেছি।"
– "কি দেখেছ?"
– "সেদিন রাতে গুদামের পেছনে এক লোককে ঢুকতে দেখেছিলাম। তার হাতে লাল রুমাল ছিল।"

অনিক কিশোরকে থানায় পাঠালেন, কিন্তু মনে মনে ঠিক করলেন—এই **লাল রুমালের সূত্রটাই এখন সবচেয়ে বড় হাতিয়ার**।

পরদিন সকালে শহরে আবার তোলপাড়। লোকেরা বলছে, বিনয়ই আসল খুনি। অন্যদিকে আবার একদল বলছে, না, হরিদাসই বিশ্বাসঘাতক।

সুমিত দে এসে বলল—
– "স্যার, আপনি যাকে খুঁজছেন, সে খুব বুদ্ধিমান। খুনের আগে থেকেই সবকিছু সাজিয়েছিল। গুদামে কাগজ, ছুরি, রুমাল—সব যেন আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য।"

অনিক ঠান্ডা স্বরে বললেন—
– "হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। খুনি জানে আমি আসব, আর সে চাইছে আমার দিকে আঙুল উঠুক।"

সুমিতের মুখে অদ্ভুত ছায়া খেলে গেল। সে আর কিছু বলল না।

রাত নামতেই অনিক আবার সজলের বাড়ি ঘুরতে গেলেন। দেওয়ালের ফাঁকে লুকানো এক পুরনো লকার পেলেন। চাবি খুঁজে খুলতেই বেরিয়ে এল একগুচ্ছ ছবি।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে—সজল, সুমিত আর… **অনিক নিজেই**।

অনিক অবাক হয়ে ছবিগুলো উলটে দেখলেন। পিছনে লেখা—
"যাকে বিশ্বাস কর, সেই-ই তোমার শেষ।"

তার মাথার ভেতর ঢাকের মতো বাজতে লাগল। কে এই ছবি তুলেছিল? আর কেন?

শহরের রাত ক্রমশ ভয়ঙ্কর হতে লাগল।
লোকেরা বাইরে বেরোতে চাইত না।
শিশুরা ঘরে বসে কান্না করত।
মন্দিরে ঢাক বাজলেও সেই শব্দ যেন এক অশুভ সঙ্কেত মনে হত।

অনিক নিজের ডায়েরিতে লিখলেন—
"খুনি খুব কাছেই আছে। সে শুধু সজলকে শেষ করেনি, বরং আমাকেও খেলায় টেনে এনেছে। তার চোখে আমি এখন পরের শিকার।"

কাগজের পাশে ছুরির ছবি এঁকে লিখলেন—
"যেখানে ছুরি, সেখানেই রক্ত। আর যেখানে বিশ্বাস, সেখানেই প্রতারণা।"

গুদামের কালো দেওয়ালে টর্চ ফেলতেই অনিক হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।
লাল রঙের মতো কিছুর দাগে কাঁপা হাতের লেখা—

"১৬"

সংখ্যার নিচে একটুকরো টানা দাগ, যেন রক্তে ডোবানো আঙুল টেনে দিয়েছে।

অনিক প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কাছে গিয়ে দেখল—ওটা রঙ নয়, সত্যিই রক্ত।
তার বুক ধড়ফড় করতে লাগল।
এক মুহূর্তে মাথার ভেতর ঝড় বয়ে গেল—

“১৬ কেন? মানে কি এর আগেও ১৫টা খুন হয়েছে?
না কি আমাকেই বার্তা দিচ্ছে খুনি?”

সে মনে করল সজলের মৃত্যুর আগে লেখা সেই তিন অক্ষর—“অ..নি..”।
গলার ভেতর শুকিয়ে গেল।
তার কানে বারবার বাজতে লাগল—“অনিক… অ-নিক…”

হঠাৎ যেন দেওয়ালের সংখ্যা নড়তে শুরু করল।
অনিক মাথা ধরে বসে পড়ল।
বুকে শ্বাস আটকে গেল, ঠান্ডা ঘাম ভিজিয়ে দিল কপাল।

মনে হলো পুরো আনারা শহরটা ফাঁকা, আর কেবল সেই **“১৬”** সংখ্যাটা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

অনিক থানায় ফিরে এলেও মাথা থেকে “১৬” সংখ্যাটা কিছুতেই সরাতে পারছিল না।
রাতের বেলা নোট লিখতে বসলে দেখল—নিজের ডায়েরির পাতায় হঠাৎ রক্তের মতো দাগে ভেসে উঠেছে সেই একই সংখ্যা।
“১৬”

অনিক থমকে গেল।
সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?
না কি কেউ ইচ্ছে করে তার টেবিলে ঢুকে এসব করছে?

জানালার কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হলো—প্রতিবিম্বটা যেন হাসছে।
তার বুক কেঁপে উঠল।

আনারা শহরে গুজব ছড়াতে শুরু করল।
লোকজন বলছে, খুনি নাকি শুধু খুন করছে না, সে একটা খেলা খেলছে।
রাত নামলেই কিছু লোক শপথ করে বলছে—কারখানার ভেতরে ফিসফিসানি শোনা যায়—
“তেরো… চৌদ্দ… পনেরো…”
আর তারপর থেমে যায় **ষোলোতে**।

বাজারে কেউ কেউ বলছে—“এই ষোলো নম্বর শিকার হয়তো অনিক পাল নিজেই।”

অনিক এসব গুজবে কান দিল না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি তৈরি হচ্ছিল।
সে জানত, শহরের চোখ এখন শুধু তার দিকেই।

আনারা শহর তখনও ভয়ে আচ্ছন্ন। সজল চৌধুরীর খুন যেন শহরের প্রতিটি কোণে অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছে। বাজারে দোকান খোলার পরও লোকজন ফিসফিস করে, "খুনি এখনও ধরা পড়েনি…", "যদি আবার কিছু হয়?" — এমন আতঙ্কে কারও মনে শান্তি নেই।

এই ভয়ের মধ্যেই একদিন ভোরে শহরে এলেন নতুন এক মুখ—**শুভ মুদি**।
গোটা শহর ততটা তাকে চিনত না, কিন্তু পুলিশের ভেতরে অনেকেই জানত—শুভ একজন দক্ষ গোয়েন্দা। আগে কলকাতায় বড় বড় কেস সমাধান করেছেন। আর একসময় অনিক পালের সহকর্মীও ছিলেন।

স্টেশনে নামতেই শুভ দেখলেন, কুয়াশা ঢাকা আনারা যেন আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। হাতে শুধু একটা কালো ব্যাগ, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

থানায় পৌঁছতেই অফিসাররা অবাক—
– "আপনি? শুভবাবু! আমাদের তো বলা হয়নি।"
– "উপরমহল থেকে নির্দেশ এসেছে," শুভ শান্ত গলায় বললেন। "খুনের কেসটা জটিল হচ্ছে। অনিকবাবু আছেন তো?"

অফিসাররা চুপচাপ মাথা নাড়ল। একজন ধীরে বলল,
– "জি, অনিকবাবু আছেন। তবে… কেমন যেন বদলে গেছেন।"

শুভ ভ্রু কুঁচকালেন। "বদলে গেছেন মানে?"

– "দিনের বেলা তদন্ত করেন, কিন্তু রাতে একা কোথায় যেন ঘুরে বেড়ান। কারও সঙ্গে তেমন কথা বলেন না। মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গেই কথা বলেন। কয়েকজন বলছে, তিনি সংখ্যার মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। বিশেষ করে—'১৬'।"

শুভর মনে হালকা অস্বস্তি হল। অনিক পালকে তিনি ভালো করেই চেনেন। শান্ত, যুক্তিবাদী, প্রমাণভিত্তিক মানুষ। তার মুখ থেকে কখনো তান্ত্রিকতা বা সংখ্যা নিয়ে পাগলামি বেরোবে, সেটা কল্পনাই করা যায় না।

সন্ধেবেলা শুভ সরাসরি সজল চৌধুরীর প্রাসাদে গেলেন। ভেতরে ঢুকতেই ভয়ংকর নীরবতা। বিশাল হলঘরে শুধু টেবিলের উপর রাখা ধূপকাঠির ধোঁয়া। আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন অনিক পাল।

শুভ ডাক দিলেন,
– "অনিকবাবু!"

অনিক চমকে ঘুরে তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড শুভকে চিনতে পারলেন না যেন। তারপর ম্লান হেসে বললেন,
– "আরে, শুভ! অনেকদিন পর… তুমি এখানে?"

– "হ্যাঁ। ওপর থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে। শুনছি কেসটা জটিল হচ্ছে। ভাবলাম তোমার সঙ্গে মিলে কাজ করব।"

অনিক ঠোঁট বাঁকালেন। "জটিল তো বটেই। তবে তুমি বুঝবে কিনা সন্দেহ আছে।"

– "মানে?" শুভ অবাক।

অনিক কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন,
– "সজল চৌধুরীর মৃত্যু সাধারণ খুন নয়। এখানে তন্ত্র আছে, মন্ত্র আছে, অশরীরী শক্তি আছে।"

শুভর বুক ধক করে উঠল। এই সেই অনিক পাল? যে যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে কেস সমাধান করত? আজ সে বলছে তন্ত্র–মন্ত্র!

পরদিন শুভ একা বেরোলেন। সজলবাবুর ব্যবসার পুরনো গুদাম ঘুরে দেখছিলেন। হঠাৎ ভেতরের দেয়ালে চোখে পড়ল শুকনো রক্তের দাগ। রক্ত দিয়ে লেখা—**“১৬”**।

তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। এ তো কাকতালীয় নয়। শহরের লোকজন যেমন বলেছিল, সত্যিই দেয়ালে এই সংখ্যা লেখা আছে।

হঠাৎ পিছন থেকে অনিকের কণ্ঠ ভেসে এল,
– "দেখলে তো? ষোলো… এই সংখ্যাটাই সবকিছুর চাবিকাঠি।"

শুভ ঘুরে তাকালেন। অনিকের চোখ অদ্ভুত জ্বলছে, যেন এক অদৃশ্য জগতে তাকিয়ে আছে।

– "অনিকবাবু, এগুলো প্রমাণ নয়। এগুলো ভয় দেখানোর চেষ্টা।"

– "না শুভ," অনিক মাথা নাড়লেন, "তুমি বুঝবে না। ষোলো জনের অভিশাপ সজলের উপর ছিল। সেই ষোলো জনের মধ্যেই খুনি লুকিয়ে আছে।"

শুভ কোনো উত্তর দিলেন না। ভেতরে ভেতরে কাঁপতে লাগলেন। কারণ তিনি জানতেন—অনিক যুক্তি ছেড়ে অন্ধকারের পথে হাঁটছেন।

রাতে থানায় ফিরে শুভ নোট লিখলেন।
"সন্দেহভাজন অনেক। কিন্তু অনিকের আচরণ অস্বাভাবিক। কাগজে সজল যে লিখে গিয়েছিল—'অ..নি..'—এটা কি আসলে অনিক পালের ইঙ্গিত? যদি তাই হয়, তবে খুনি কি সত্যিই…?"

শুভ থেমে গেলেন। লিখতে পারলেন না।
কারণ অনিক পাল শুধু তার সহকর্মী নন, একসময় তার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু সত্য যদি ভয়ংকর হয়, তাহলে বন্ধুত্বের দামও কমে যায়।

আনারার রাত যেন দিনকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। হাওয়া থমথমে, চারদিকে শালবনের অন্ধকারে অদ্ভুত শব্দ। শুভ মুদি বুঝতে পারছিলেন—এই কেসের রহস্য কেবল খুন বা প্রতিশোধ নয়, আরও গভীরে কিছু আছে।

শুভ পুরনো নথি ঘাঁটতে গিয়ে একটা চমকপ্রদ তথ্য পেলেন।
কিছুদিন আগে অনিক নিয়মিত যাতায়াত করছিল এক তান্ত্রিকের আস্তানায়। শহরের প্রান্তে ভগ্নপ্রায় মন্দির, লোকেরা বলে সেখানে মধ্যরাতে অদ্ভুত অনুষ্ঠান হয়।

থানার এক কনস্টেবল মুখ খুলল,
– "স্যার, কয়েকবার দেখেছি অনিকবাবু রাতের দিকে ওইদিকে যাচ্ছেন।"
– "কেন যান?" শুভ জিজ্ঞেস করলেন।
– "কে জানে! তবে শুনেছি, তিনি সংখ্যার রহস্য আর মন্ত্রের শক্তিতে ভীষণ বিশ্বাসী হয়ে গেছেন।"

শুভর বুক ধক করে উঠল। এ তো সেই মানুষ, যিনি একসময় বলতেন—*"প্রমাণ ছাড়া কিছুই নেই"*।

আরও গভীরে খুঁজে শুভ এক চমকপ্রদ সত্য জানলেন।
সজল চৌধুরী আসলে অনিক পালের *মামা*। হ্যাঁ—অনিক তার বড় বোনের ছেলে।

এক বৃদ্ধ আইনজীবী বললেন,
– "সজল চৌধুরীর উইল ছিল। তাতে লেখা, মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগ হবে। অর্ধেক স্ত্রী মধুমিতার, আরেক অর্ধেক যাবে তার একমাত্র আত্মীয়—ভাগ্নে অনিক পালের কাছে।"

শুভ হকচকিয়ে গেলেন।
মানে যদি সজলের মৃত্যু হয়, তবে কোটি টাকার সম্পত্তি যাবে অনিকের হাতে!

সন্ধ্যায় শুভ অনিকের সঙ্গে দেখা করলেন। চুপচাপ চা খেতে খেতে বললেন,
– "সজলবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?"

অনিক চোখ নামালেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,
– "হ্যাঁ, উনি আমার মামা। তবে আমি কাউকে বলিনি। লোক জানলে তদন্তে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠত।"

– "তাহলে তার উইলের কথাও জানতেন?" শুভর কণ্ঠে চাপা কঠোরতা।

অনিক হঠাৎ হেসে উঠলেন। হাসিটা অদ্ভুত—গভীর, শীতল।
– "জানি। কিন্তু জানো শুভ, এটা কেবল টাকার খেলা নয়। মামা আমায় ছোটবেলা থেকে অপমান করতেন। বলতেন, আমি কিছুই হতে পারব না। সেই দাগ আমি আজও বয়ে বেড়াই।"

শুভ চমকে উঠলেন। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা কি তবে সত্যিই খুনি?

অনিকের ঘরে ঢুকে শুভ একদিন অবাক হয়ে গেলেন। টেবিল ভর্তি তাবিজ, কালো মোমবাতি, অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা কাগজ। দেয়ালে ঝোলানো তামার পাতায় খোদাই করা—**“ষোলো দেবতার অভিশাপ”**।

অনিক শান্ত স্বরে বললেন,
– "তুমি জানো না শুভ, মামার মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা নয়। ষোলো দেবতা তাকে নিতে এসেছিল। আমি কেবল মাধ্যম।"

শুভর শরীর শিউরে উঠল।
– "অনিক, তুমি কী বলছ? গোয়েন্দা তুমি, প্রমাণের মানুষ তুমি! হঠাৎ এই অন্ধকারে নামলে কেন?"

অনিক উত্তর দিল না। শুধু তাকালেন সেই ভয়ংকর তাবিজগুলোর দিকে।

শুভ তার নোটে লিখলেন—
"এখন স্পষ্ট। অনিক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সজলের প্রতি ঘৃণা, তান্ত্রিকতার প্রভাব, আর সম্পত্তির লোভ মিলে তাকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। প্রমাণ হয়তো এখনও হাতে নেই, কিন্তু সত্যিটা তার চারপাশেই ঘুরছে।"

আনারা শহরে ভয়ের আবহ ছড়িয়ে পড়ছিল। মানুষজন খোলা মুখে কথা বলত না, সবাই সন্দেহের চোখে তাকাত। দোকানে বসা বৃদ্ধ বলত,
– "এবার তো কেসও সামলাতে পারছে না অনিকবাবু। প্রতিদিন নতুন নতুন ছায়া ঘুরছে।"

শুভ মুদি সব শোনেন, কিছু বলেন না। তার চোখ সবসময় পর্যবেক্ষণে থাকে। তিনি জানতেন, এই ছায়ার মাঝেই সত্যি লুকিয়ে আছে।

সজলবাবুর গুদামের ভাঙা দেওয়ালে রক্ত দিয়ে লেখা **"১৬"** শুভকে অস্থির করে তুলেছিল। রাতের আঁধারে আবার সেই সংখ্যাটা কারা যেন আঁকছে—লোকেরা বলল, "নিশ্চয়ই ভূত।"

কিন্তু শুভ দেখলেন, রাতের আড়ালে গোপনে অনিক সেখানেই যাচ্ছে। হাতে লণ্ঠন, ঠোঁটে মন্ত্রোচ্চারণ। তিনি ফিসফিস করে বলছিলেন,
– "ষোলো… ষোলো… দেবতার শক্তি…"

শুভ দূর থেকে দেখলেন, অনিক সেই দেওয়ালে রক্ত মাখা আঙুল টানছেন। বুকের ভেতর ধক করে উঠল।

শুভ ধীরে ধীরে প্রমাণ জোগাড় করতে শুরু করলেন।

1. ফরেনসিক রিপোর্টে ধরা পড়ল—সজল চৌধুরীর শরীরে যে ছুরির আঘাত, সেটি অনিকের টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া এক ছুরির সঙ্গে মিলে যায়।

2. গোপন সাক্ষী জানাল, হত্যার রাতে অনিককে সজলের বাড়ির কাছাকাছি দেখা গিয়েছিল।

3. সজলের ডায়েরির শেষ পাতায় লেখা—“যাকে বিশ্বাস করি, সেই-ই ছুরি লুকিয়ে রেখেছে”—শুভ এখন নিশ্চিত হলেন, সেটি অনিককেই উদ্দেশ্য করে লেখা।

এক রাতে শুভ হঠাৎ অনিকের ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঘরে কালো মোমবাতি জ্বলছে, চারপাশে লাল ধূপের গন্ধ। অনিক মাটিতে বসে মন্ত্র জপছে।

শুভ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,
– "অনিক, এই নাটক আর কত? তুমি জানো, প্রমাণ সব তোমার দিকেই ইঙ্গিত করছে।"

অনিক মাথা তুলল। চোখ লাল, মুখে শীতল হাসি।
– "তুমি বুঝবে না শুভ। মামা শুধু টাকা নয়, আমার আত্মাকে বন্দি করে রেখেছিল। তন্ত্রই আমায় মুক্ত করেছে। ষোলো দেবতা চাইছিলেন তার রক্ত। আমি কেবল হাতিয়ার।"

শুভ গর্জে উঠলেন,
– "তুমি গোয়েন্দা! মানুষের রক্ষক! অথচ তুমি নিজেই খুনি?"

অনিক হঠাৎ ছুরি তুলে দাঁড়াল,
– "আমি খুনি নই, আমি দেবতার বেছে নেওয়া মাধ্যম!"

পরদিন সকালে থানায় জনতার ভিড়। শুভ মুদি সমস্ত প্রমাণ হাজির করলেন—ছুরি, ফরেনসিক রিপোর্ট, সজলের ডায়েরি, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান।

সবাই অবাক হয়ে গেল। যে মানুষ এতদিন ধরে তদন্ত করছিলেন, সেই-ই আসল খুনি!

শুভ শান্ত কণ্ঠে বললেন,
– "অনিক পাল সজল চৌধুরীর ভাগ্নে। সম্পত্তি ও প্রতিশোধের নেশা, আর তান্ত্রিক বিভ্রম তাকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।"

অনিক মাথা নীচু করে বসেছিল। ঠোঁটে ফিসফিস—
– "ষোলো… ষোলো… ষোলো…"

অনিককে যখন হাতকড়া পরানো হল, সে চিৎকার করে উঠল,
– "আমি খুনি নই! দেবতার ইচ্ছা পূরণ করেছি! ষোলো দেবতা আবার ফিরবে!"

শহর স্তব্ধ। সবাই তাকিয়ে রইল। শুভ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন থানার বারান্দায়। আকাশে রক্তাভ সূর্য ডুবে যাচ্ছিল।

তিনি ডায়েরিতে শেষ লাইনটা লিখলেন—
“অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, সত্য এবং সাহস সবসময় জয়ী হয়।”

প্রিয় পাঠক বন্ধু,

এই গল্প আমাদের দেখিয়েছে, অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, সাহস ও সত্য সবসময় জয়ী হয়।
রহস্য বা কঠিন পরিস্থিতি কখনো আমাদের ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু নিজের অন্তরের আলোতে বিশ্বাস রাখলে সব বাধা পেরোনো সম্ভব।

সজল, অনিক এবং শুভ মুদি—তাদের গল্প থেকে বোঝা যায়, ধৈর্য, সাহস এবং সঠিক সিদ্ধান্ত সবসময় সাফল্যের পথ খুলে দেয়।

আপনার জীবনে যদি কখনো সমস্যা বা অন্ধকার আসে, মনে রাখবেন—সত্য, সাহস এবং বিশ্বাস কখনো হারায় না।

ধন্যবাদ, বন্ধু, গল্পটি পড়ার জন্য। আশা করি এটি আপনার মনকে কিছুটা আলো দিয়েছে।